জোতদারের বিরুদ্ধে ভূমিহীন
একটি সফল আন্দোলন

উপরের ছবিটি ১৯৮৬ সালের। জোতদারদের দখলে থাকা খাস জমি দখলের সংগ্রামে ভূমিহীনরা হাতে তুলে নিয়েছিল লাঠি। ভূমিহীনদের পাশে দাঁড়িয়েছিল সমতা। দখল ছেড়ে পালিয়েছিল জোতদাররা ...

সরেজমিনে অনুসন্ধান করেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

দেশে ৩৩ লাখ একর খাস জমি আছে সরকারি হিসেবে। যদিও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন খাস জমির পরিমাণ এর চেয়ে আরো অনেক বেশি। কারণ অনেক চর এবং বেদখলী জমি আছে যা এখনো সরকার খাস খতিয়ানের আওতায় আনতে পারেনি। দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সব খাস জমির দাবিদার ভূমিহীন মানুষ। কিন্তু দেশে প্রায় সব খাস জমিই অবৈধভাবে দখল করে আছে জোতদার, মহাজন এবং বিত্তশালীরা। সরকারি এসব খাস জমি দখল করে জোতদাররা আরো ধনী হচ্ছে আর ভূমিহীনের দিন কাটছে অর্ধাহারে অনাহারে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মহাসচিব বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারকাত মনে করেন, ৩৩ লাখ একর সরকারি খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের মাধ্যমে দেশের এক কোটি মানুষের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের আইন করেন। কিন্তু খাস জমিগুলো ভূমিহীনদের মাঝে বন্টনের ব্যবস্থা হয়নি। এর পরে গত তিন দশকের সরকারগুলো ভূমিহীনদের সমর্থন পাওয়ার জন্য খাস জমিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গিকার করলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বরং সরকারি দলগুলো স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের নেতারা অবৈধ দখলদারদের সহায়তা করেছে অথবা নিজেরাই দখল করে রেখেছে খাস জমি।

সত্তরের দশক থেকেই কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা খাস জমিতে ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে আসছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কারো উল্লেখ করার মত সাফল্য চোখে পড়ে না। তবে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার অজপাড়া গাঁয়ের (বিষ্ণুপুর) ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠন সমতা এক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিজয় অর্জন করেছে। সমতার ভূমিহীন আন্দোলনের কল্যাণে পাবনা, রাজবাড়ি এবং সিরাজগঞ্জের (আংশিক) ৪ হাজার ৭২৯ একর ৪৩ শতাংশ জমিতে ৬ হাজার ৬৯১টি ভূমিহীন পরিবার বন্দোবস্ত পেয়েছে। যার বাজার মূল্য ৪৭ কোটি ২৯ লাখ ৪৩ হাজার টাকা। আরো কিছু জমি উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে। সেসব জমি উদ্ধার হলে ভূমিহীনদের মাঝে বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ হবে ৫৪ হাজার ৮৭২ একর ৪২ শতাংশ।

ঘুঘুদহে আন্দোলনের সূচনা

ঘুঘুদহ উত্তরবঙ্গের একটি ঐতিহাসিক বিল। পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় এর অবস্থান। ১৯৬২ সালের আগ পর্যন্ত এই বিলটি সারাবছর পানিতে থৈ থৈ করত। ফলে চাষাবাদ হতো না। বিশাল বিলটির চারদিকে ৪টি ইউনিয়নের ২০টি

গ্রামের প্রায় সব মানুষ বরাবর দরিদ্র। মজুরি খেটে খাওয়ার অবস্থাও ছিল না। কারণ সবই দরিদ্র, কে কাকে কাজ দেবে। বিলের পানিতে মাছ ধরে বিক্রি করেই তাদের দিন চলত। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় ধৃত মাছের দাম পেতো না তারা। দিনে একবেলা অথবা কোনো কোনো দিন না খেয়েই কাটত তাদের সময়। ছোট ছোট ছনের ঘরে তারা বাস করত। এদের অনেকের আবার ঘর করার সামর্থ্য ছিল না। খোলা আকাশের নিচে গাছতলায় কেউ কেউ সংসার করত। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য কলাপাতা দিয়ে ছেলে মেয়েদের ঢেকে রাখত। শিক্ষা অথবা চিকিৎসার সব রকম সুবিধা থেকেই তারা ছিল বঞ্চিত।

১৯৬২ সালে আইয়ুব সরকার বিলের পাশ দিয়ে ইছামতি নদী বরাবর ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল খনন করে। খাল বেয়ে বিলের পানি নেমে যায় ইছামতিতে। জেগে ওঠে হাজার বিঘা আবাদী জমি। জমি জেগে ওঠার পরপরই স্থানীয় জোতদার, জমিদার এবং ভূমিগ্রাসিদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে ঘুঘুদহের বিলে। এরা স্থানীয় প্রশাসনকে হাত করে বিভিন্ন রকম ভুয়া কাগজপত্র বানিয়ে গোটা ঘুঘুদহ বিলের জমি দখলে নিয়ে চাষাবাদ করতে থাকে। ধনী জোতদার মহাজনদের গোলা ভরে উঠতে থাকে ধানে। কিন্তু এই জমির প্রকৃত দাবিদার ভূমিহীনরা আগের মত তিমিরেই থেকে যায়। তবে কয়েকজন জোতদারের জমিতে দিন মজুরি করার সুযোগ পায় স্বল্পসংখ্যক ভূমিহীন। কিন্তু শ্রমিক সহজলভ্য হওয়ায় তাদের কদর ছিল না। অমানবিক পরিশ্রম করিয়ে বয়স ভেদে ৫০ পয়সা থেকে ৮ টাকা পর্যন্ত দৈনিক মজুরি দিত। কেউ কেউ মজুরি ছাড়াই দু' বেলা খেয়ে মজুরি দিত জোতদারদের বাড়িতে।

১৯৮৩ সালে সাঁথিয়ার ভূমিহীনরা সমতার ব্যানারে জোতদারদের কাছ থেকে খাস জমি উদ্ধারের লক্ষ্যে সংগ্রাম শুরু করে। এ পর্যায়ে ঘুঘুদহ বিলের খাস জমি ভূমিহীনদের দখলে নেয়ার জন্য আইনি লড়াই শুরু করে সমতা। ব্রিটিশ সাহায্য সংস্থা অক্সফাম বাংলাদেশ মামলা পরিচালনার জন্য সমতাকে ৪৩ হাজার টাকা প্রদান করে। সমতা ভূমিহীনদের পক্ষে জোতদারদের ১৮টি ভুয়া দলিলের কোর্টে মামলা দায়ের করে। মামলা করা হয় ভূমিহীনদের পক্ষে। ফলে ১৮টি ভুয়া দলিলের ৬৫ বিঘা জমি সরকারি খাস খতিয়ানে চলে আসে। সমতা জমিগুলো এক বছরের জন্য লিজ নেয়। কিন্তু দখলে নিতে ব্যর্থ হয়। এই জমিগুলো এতকাল ভোগদখল করত স্থানীয় খেতুপারা ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান মোসলেম উদ্দিন। খাস জমি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি ভূমিহীনদের ওপর নানা রকম অত্যাচার শুরু করেন। ভূমিহীনদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ভূমিহীনদের কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করতে না দিয়ে এবং দুস্থমাতা কার্ড না দিয়ে ভূমিহীনদের ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করেন।

এরা এক সময় জোতদারদের জমিতে মজুরি খাটতো। এখন ফসল ফলাচ্ছে নিজেদের জমিতে

এক পর্যায়ে চেয়ারম্যান মোসলেম উদ্দিন রঘুরামপুর গ্রামের ভূমিহীনদের অগ্রণী দলনেতা মাজেদ আলীর ১৮টি বাবলা গাছ জোর করে কেটে নেয়ার জন্য আসে তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে। ভূমিহীনরা ঐক্যবদ্ধভাবে চেয়ারম্যানের সন্ত্রাসী বাহিনীকে রুখে দেয়। এটাই ঘুঘুদহ পাড়ের ঐক্যবদ্ধ ভূমিহীনদের সম্মুখ সমরে প্রথম বড় ধরনের বিজয়। এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে বিজয়ে ভূমিহীনদের দারুণভাবে উৎসাহিত করে। এ পর্যায়ে ভূমিহীনরা সিদ্ধান্ত নেয় সকলে এক সঙ্গে বিলে নেমে লিজে পাওয়া ৬৫ বিঘা জমি দখলে নেবে।

১৯৮৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর হাজার হাজার ভূমিহীন একটি স্কুল মাঠে এসে জড়ো হয়। এরপর হাজার হাজার ভূমিহীন নারী-পুরুষ বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে মিছিল করতে করতে বিলের দিকে রওনা হয়। জোতদাররা বিষয়টি আগে থেকে আঁচ করতে পেরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে ৫/৬ শ' ভাড়াটে সন্ত্রাসীকে নিয়ে আগে থেকেই বিলে অবস্থান নেয়। কিন্তু ভূমিহীনদের সংখ্যাধিক্য এবং দৃঢ় মনোবল দেখে জোতদার বাহিনী ভড়কে যায়। ফলে কোনো রকম রক্তপাত ছাড়াই লিজগ্রহণের এক বছর পরে ঐদিন ৬৫ বিঘা জমিতে ভূমিহীনদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। ৬৫ একর জমিতে ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিনই তারা সিদ্ধান্ত নেয় ঘুঘুদহ বিলের সকল খাস জমি পর্যায়ক্রমে অবৈধ দখলদারমুক্ত করে ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার।

ঘুঘুদহ বিলে শুধু ধান নয়, সুস্বাদু মাছও পাওয়া যায়

এ পর্যায়ে ভূমিহীনদের সংগঠন সমতা ৩৫০ একর খাস জমি লিজের জন্য আবেদন করে, কিন্তু লিজ পায় ২১০ একক জমির। এ ঘটনায় ভূমিহীনরা আরও উৎসাহিত এবং জোতদারেরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এ সময় ভূমিহীন দলনেতাদের এক পর্যালোচনা বৈঠকে জোতদাররা আক্রমণ করে ৭ জন ভূমিহীন নেতাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। এই ঘটনার ফলে ভূমিহীনরা তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এবং মিছিল ও সমাবেশে এলাকা প্রকম্পিত করে। এতে আতঙ্কিত

জোতদারেরা গা ঢাকা দেয়।

১৯৮৫ সালের ৫ জুন সমস্ত এলাকায় জোতদারেরা ভূমিহীন সমিতিগুলোর ওপর একযোগে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। সমিতির লোকজনকে অহেতুক মারধর করে, মৎস্যজীবী পাড়ায় হামলা চালায়, জমির ধান কেটে নেয় এবং ভূমিহীনদের খড়ের ঘর পুড়িয়ে দেয়।

এ ঘটনার পর সব এলাকার ভূমিহীনরা এক সমাবেশে মিলিত হয় এবং প্রকাশ্যে দিন ঘোষণা করে জোতদারদের মুখোমুখি হবার ও বিলে নামার পক্ষে মত রাখে। সমাবেশে সর্বসম্মতিক্রমে একই বছরের ১০ জুন সোমবার দিন বিলে নামার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভূমিহীনরা জিতবে আর না হয় স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণ করার শপথ নিয়ে সমাবেশ শেষ করে।

ঘটনার দিন মৎস্যজীবী সদস্যরাই প্রথমে তীর, ধনুক, ঢাল, ফালা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তৈরি হতে থাকে। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য ভূমিহীন দলগুলোও নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় করে। তাছাড়া সমতার পক্ষ থেকে ১ হাজার লাঠি তৈরি করা হয়। অন্যদিকে জোতদারদের জোটও শক্তি পরীক্ষার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে ভাড়া করা লাঠিয়াল, মাস্তান ও দাঙ্গা সর্দার আমদানি করে।

১০ জুন সকাল ৭টা থেকে সমতা কার্যালয়ে ভূমিহীনদের সংগ্রামের প্রতীক লাল পতাকা ওড়ানো হয়। চতুর্দিক থেকে দলে দলে ভূমিহীনরা স্কুল মাঠে আসতে থাকে। মাইকে গণসঙ্গীত বাজতে থাকে। সামান্য সময়ের মধ্যেই এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। হাজার হাজার সমতা সদস্য ছাড়াও আরও কয়েক হাজার উৎসুক সমর্থক সেখানে হাজির হয়ে ভূমিহীনদের উৎসাহিত করতে থাকে। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে জোতদাররা ৭/৮ শ' লোকের একটা দল নিয়ে মাঠে নামে। তারা ভূমিহীনদের নামে লিজকৃত খাস জমিতে কালো পতাকা ওড়ায়। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল ভাড়া করা লাঠিয়াল, মাস্তান ও অস্ত্রধারী।

এদিকে বেলা বাড়ার সঙ্গেই ভূমিহীনদের দলও বড় হতে থাকে। এক পর্যায়ে প্রায় ১৫ থেকে ১৮ হাজার লোকের সমাগম ঘটে। ভূমিহীনদের স্ত্রী-কন্যারাও এই মরণজয়ী সংগ্রামে অংশ নেয়। মৎস্যজীবী মহিলারা কোমলে কাপড় বেঁধে তীর, ধনুক, লাঠি, সড়কি প্রভৃতি স্থানীয় অস্ত্রসহ বিলের পূর্ব দক্ষিণ দিক পাহারা দেয়ার দায়িত্ব নেয়। একদল মহিলা মূল দলের রসদ সরবরাহ করার জন্য তাদের পেছনে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।

শুরু হয় হাজার হাজার ভূমিহীনের গগনবিদারী হুংকার। তাদের হুংকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়। জোতদারগণ যখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে যে তারা হাজার হাজার ভূমিহীন দ্বারা বস্তুত ঘেরাও হয়ে গেছে তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ভূমিহীনেরা রণহুংকার দিতে দিতে বিলের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে অপেক্ষমাণ কালো পতাকাধারী জোতদারদের জোট কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। ভূমিহীনদের সংগঠিত দল যত এগুতে থাকে, জোতদারদের দল তত পিছু হটতে থাকে। বিলের মাঝ বরাবর একটা খালের দুই পাশে সমতার ভূমিহীনেরা ও জোতদারদের বাহিনী অবশেষে অবস্থান নেয়। ভূমিহীনদের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়তে থাকে। একসময় ভূমিহীনরা জোতদারদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়। এমন অবস্থায় সাঁথিয়ার প্রবীণ সাংবাদিক গোলাম মোর্শেদ সাদা পতাকা হাতে নিয়ে দুই দলের মাঝখানে দাঁড়ান। পরবর্তীতে তার মধ্যস্থতায় বিনা রক্তপাতে ভূমিহীনরা ঘুঘুদহের খাস জমিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

তবে জোতদার বাহিনী ফিরে যাবার সময় দূরবর্তী ঘুঘুদহ মৎস্যজীবী পাড়ায় আক্রমণ করে এবং নারীদের ওপর নির্মম ও অকথ্য অত্যাচার করে বহু নারীকে মারাত্মকভাবে আহত করে। গর্ভবতী মায়ের পেটে লাথি মেরে গর্ভপাত করিয়ে দেয়ার মত নারকীয় ঘটনাও তারা ঘটায়।

এইভাবে জোতদাররা হেরে গিয়ে তাদের ষড়যন্ত্রের কৌশল পরিবর্তন করে। ভূমিহীনদের নামে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা মামলা রুজু করে সমতার কর্মকর্তাসহ ৩১১ জনকে গড়ে ১১ মাস জেল খাটায়। সমতার রেজিস্ট্রেশন বাতিলের ষড়যন্ত্র করে। সমতার কর্মকর্তাসহ ভূমিহীনরা ৫৬টি মামলার মধ্যে ৫৫টিতে বিচারে খালাস পেলেও শেষটিতে মেজর মঞ্জুর কাদেরের (তৎকালীন জাতীয় পার্টির নেতা ও এমপি) প্রভাবে সমতার ৪ জন কর্মীসহ ২ জন ভূমিহীন দলনেতার ৭ বছরের জেল হয়ে যায়। বর্তমানে তারা ২ বছর জেল খাটার পর হাইকোর্টের জামিনে রয়েছেন। কিন্তু কোনো বাধা, কোনো ষড়যন্ত্রই রুখতে পারেনি ভূমিহীনদের। তারা ঘুঘুদহের খাস জমিতে অবশেষে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই ছেড়েছে।

ঘুঘুদহের বিল পরিদর্শনে গিয়ে আমরা ভূমিহীনদের কাছে শক্তিশালী জোতদারদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ জয়ের গল্প শুনেছি অবাক বিস্ময়ে। ভূমিহীন রফিকুল (৪৫), মতিন (৩৫), আবুল হোসেন (৫২), মনসুর (৪৮), জয়নাল (৭৫), আবু খায়ের (৬৫), জোমেলা (৬০) এবং হাসেন আলীরা (৮০) জোতদারদের বিরুদ্ধে তাদের অসম সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা করতে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছে, জোতদারদের অত্যাচার নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছে।

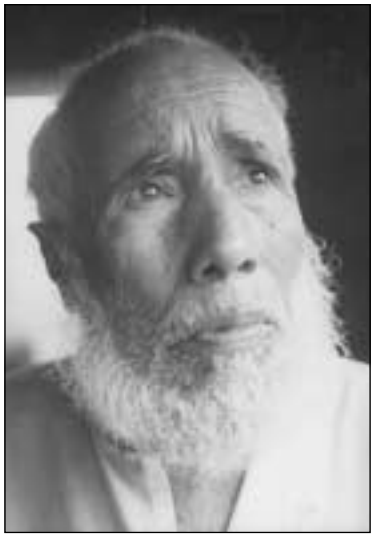

ঘুঘুদহ বিলের সবচেয়ে বেশি জমি দখল করেছিলেন জোতদার আব্দুস সাত্তার চেয়ারম্যান

৭০ বছরের বৃদ্ধ হোসেন আলী জোতদারদের ৫৬টি মিথ্যা মামলার খড়গ কাঁধে নিয়ে ফিরছেন

ঘুঘুদহের মানুষের বর্তমান অবস্থা

একখন্ড ভূমিই বদলে দিতে পারে মানুষের জীবন যাত্রা, দিতে পারে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক নিরাপত্তা। ভূমিই সমাজের অবহেলিত নিপীড়িত মানুষকে দিতে পারে সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার। আর এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে ঘুঘুদহের ভূমিহীন মানুষের জীবনে। ভূমিহীনদের সফল সংগ্রামের ফলে সরকার ঘুঘুদহ বিলের চারপাশে ২০টি গ্রামের ১ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৭১০ একর জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ মালিকানায় পরিবারগুলো ২ থেকে সাড়ে ৪ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক হয়েছে।

সেখানে শীতকালে ফসল এবং বর্ষাকালে মাছ চাষ করে। জমির ফসল থেকে তাদের দশ মাসের খোরাক মিটে যায়, মাছ বিক্রি করে এবং অফসল মৌসুমের কিছু সময় শ্রম বিক্রি করে খুব ভালোভাবেই কেটে যায় তাদের জীবন। এখন আর অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী নয়। যেখানে এক টুকরো ছনের ঘর ছিল, সেখানে তৈরি হয়েছে টিনের দোচালা ঘর, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং টিউবওয়েল। গণশিক্ষা স্কুল থেকে নিজেরা লেখাপড়া শিখেছে এবং তাদের সকল ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছে, এখন তারা বিল কমিটি গঠন করে বিলের উন্নয়ন করছে, গ্রামীণ বিচার সালিশে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে এখন জেন্ডার, ভূমি অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে

ভালোভাবে সচেতন। মোটকথা, ভূমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের সামাজিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। এখন তারা সুশীল সমাজের এক বড় অংশ, যা আগে কখনো চিন্তাই করা যেতো না। কেননা, ভূমি আন্দোলন পরবর্তীতে ভূমিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, ঘুঘুদহের ২০টি গ্রামে ভূমিহীনদের ২৫০টির মত সমিতি আছে। প্রতিটি সমিতিতে ২০ থেকে ২৫ জন সদস্য আছে। সমিতির সদস্যরা সবাই জমির মলিক হননি। এক্ষেত্রে এখানের ভূমিহীনরা এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যারা জমি পায়নি তাদের সঙ্গে নিয়ে ২০/২৫ জন একত্রে সকলের জমি চাষ করে ফসল ভাগ করে নিচ্ছে। কোনো কোনো সমিতি আবার ফসল ভাগ না করে যে জমি পায়নি তাকে সবাই মিলে কিছু কিছু জমি ছেড়ে দিয়েছে। কিছু জমি না পাওয়া ভূমিহীনকে সমতা ঋণ দিয়ে শ্যালো মেশিন কিনে দিয়েছে। তারা কৃষকদের জমিতে পানি সেচ দিয়ে উৎপাদিত ফসলের এক চতুর্থাংশ পাচ্ছে। তারপরও বেশ কিছু ভূমিহীন পরিবার আছে যারা প্রত্যক্ষভাবে এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত। রঘুরামপুরের মৎস্যজীবী পাড়া পরিদর্শনে গিয়ে এরকম বেশ কিছু পরিবার আমাদের চোখে পড়েছে। এ সম্পর্কে সমতার নির্বাহী পরিচালক আব্দুল কাদেরকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এখানে প্রায় সব মানুষই দরিদ্র, হাজার হাজার পরিবারকে জমি পাইয়ে দেয়ার মতো জমি এখানে নেই। যারা তুলনামূলকভাবে বেশি গরিব সেসব পরিবার যাতে আগে জমি পায় সেটিই আমরা দেখার চেষ্টা করেছি। তবে যারা জমি পায়নি তারাও পরোক্ষভাবে লাভবান হয়েছে, তাদের নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়েছে মজুরি বেড়েছে। ঘুঘুদহের ভূমিহীন এখন এতটা সংঘবদ্ধ যে তারা ঐসব অঞ্চলে এখন সবচেয়ে শক্তিশালী। তার প্রমাণ মিলেছে স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচনগুলোতে। ১৯৯০ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সাঁথিয়া উপজেলাতে ভূমিহীনদের সমর্থিত প্রার্থী তৎকালীন ক্ষমতাসীনদলের শক্তিশালী প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে। ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নগুলোর ৫৪টি মেম্বার পদের মধ্যে ভূমিহীনরা দখল করে ৪৩টি।

নির্যাতিত হয়েছেন যারা

ঘুঘুদহের খাস জমিতে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জোতদারদের হাতে খুন হয়েছে ৯ জন। ভূমিহীনদের ভাষ্য অনুযায়ী জোতদাররা চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে কোনো এক ভূমিহীনকে খুন করে অপর ভূমিহীনদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা ঠুকে দিয়েছে। জোতদারদের ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় এ পর্যন্ত ৩০৬ জন ভূমিহীন জেল হাজত খেটেছে। শারীরিকভাবে নির্যাতিত

'যাদের জন্য আন্দোলন তাদের সংগঠিত ও সচেতন করতে পারলে যে কোনো আন্দোলন সফল হতে পারে'

মোঃ আব্দুল কাদের
নির্বাহী পরিচালক, সমতা

সাপ্তাহিক ২০০০ : '৮০ দশকের শুরুতে যখন আন্দোলন শুরু করেন তখন আপনারা জোতদারদের চেয়ে অর্থ, ক্ষমতাসহ সব দিক থেকেই দুর্বল ছিলেন। এরকম একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষের জমি দখলের আন্দোলনে যাবার সাহস পেলেন কি ভাবে?

আব্দুল কাদের : হ্যাঁ তারা আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী। এখনো তা নিঃশেষ হয়নি। তবে তারা ছিল অবৈধ দখলদার। যে অবৈধ কাজ করে সে মানসিকভাবে দুর্বল থাকে। আর ভূমিহীনরা ছিল আবহমানকাল থেকে বঞ্চিত, নির্যাতিত যখন আমরা তাদের অধিকার সম্পর্কে জানালাম, তারাই সচেতন হয়ে সংগঠিতভাবে এগিয়ে আসার সংকল্প গ্রহণ করলো। আমরা জোতদারদের বিরুদ্ধে যে জয়টি পেয়েছি এই শক্তিটি আসলে মানুষের। আমাদের খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের সাড়া পেতে, যেহেতু আমরা তাদের বিশ্বাস করাতে পেরেছিলাম আমরা তাদের অধিকারের জন্যই কাজ করতে চাই।

২০০০ : আপনি নিজে ভূমিহীন নন। তবে ভূমিহীনদের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিলেন কোন প্রেরণায়?

আব্দুল কাদের : আমার বাবা মাঝারি গোছের একজন কৃষক। ছেলেবেলা থেকেই আমি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এভাবে মানুষের সঙ্গে আমার প্রতিনিয়ত মেলামেশা হতো। আমি এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আমি যখন ভূমিহীন পাড়াগুলোতে যেতাম, দেখতাম এদের অমানবিক জীবনযাপন। মাথার ওপরে চাল নেই, ঘরের ভিটিতে সন্তানকে শুইয়ে রেখে কলাপাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছে যাতে শিশির সন্তানের গায়ে না পড়ে।

এরা অত্যন্ত দরিদ্র। প্রায় প্রতিদিনই এরা একবেলা খেত দুই বেলা উপোস করতো। এসব দেখে আমার মনে হতো এরা কি পুরুষাণুক্রমে এভাবে কষ্ট করেই যাবে? এদের ভাগ্যের পরিবর্তন কি কখনো হবে না? এক পর্যায়ে আমার মাথায় আসে ঘুঘুদহের বিলে সহস্রাধিক একর জমি জোতদাররা অবৈধভাবে লুটে পুটে খাচ্ছে, এই জমিতে ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

এর পরে আমার স্কুল চাকরির পাশাপাশি সময় বের করে বন্ধুদের নিয়ে ভূমিহীন সমিতি গড়ে তুলি পাড়ায় পাড়ায়। এভাবে সংগঠিত হয়েই আমরা অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করি। যেহেতু তাদের কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না, মামলার রায় ভূমিহীনদের পক্ষে হয়।

২০০০ : হাজার হাজার নিরক্ষর ভূমিহীনকে আপনি নানামুখী ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ রাখলেন কিভাবে?

আব্দুল কাদের : ষড়যন্ত্র হয়েছে সব রকম কৌশল ও অপকৌশলে। জোতদারদের মদদে পাল্টা ভূমিহীনদের সংগঠনও তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সব কৌশলেই ভূমিহীনরা ব্যর্থ করে দেয়। তারা যখন দেখেছে আমাদের ওপর নানা রকম অত্যাচার ও প্রেসার থাকা সত্ত্বেও তাদের ছেড়ে যাচ্ছি না। তখন তারা আস্থা পেল, যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা তাদের পাশে আছি। যার কারণে কখনোই তারা আমাদের ছেড়ে চলে যায়নি। তা ছাড়া সাংবাদিক, সুশীল সমাজ এবং বাম সংগঠনগুলো ভূমিহীনদের এই আন্দোলনে বড় রকমের সহায়তা করেছে। কিছু দেশপ্রেমিক সরকারি অফিসার এবং মানবাধিকার সংগঠনও আমাদের সহায়তা করেছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদকে চাপ দিয়েছিল আমাদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করতে।

২০০০ : সমতার সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে বলুন?

আব্দুল কাদের : সমতার নির্বাহী বোর্ডে ১১জন সদস্যের মধ্যে আমি ছাড়া সভাপতিসহ সকলেই ভূমিহীন। ভূমিহীনদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটি পরিচালিত হয়। এছাড়া দেশের বিশিষ্ট জনদের নিয়ে ৭ সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদ আছে। যেখানে ড. হোসেন জিল্লুর, ড. আহমেদ কামাল এবং খুশি কবিরের মতো ব্যক্তিরা রয়েছেন।

জোমেনা জমি এবং ঘর দুটোই পেয়েছেন। কিন্তু এই ভূমিহীন জেলে কোনটিই পাননি

হয়েছে ৩ শতাধিক। ঘুঘুদহ বিলের খাস জমিতে এ পর্যন্ত প্রকৃত ভূমিহীনদের যতটুকু আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অর্জিত হয় এক দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই সংগ্রাম করতে গিয়ে ভূমিহীনদের জোতদার আর তাদের আশ্রিত প্রশাসনের হাতে নির্বিচারে হামলা আর মামলার শিকার হতে হয়। জোতদাররা সব সময়ই ভূমিহীনদের নামে একের এক এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে অযথা হয়রানি আর পুলিশি ভয় দেখিয়ে সংঘবদ্ধ ভূমিহীনদের মনোবল ভাঙতে চেয়েছে। জোতদারদের দায়ের করা অগণিত মামলা আর হামলায় ভূমিহীনদের অবর্ণনীয় কষ্ট পোহাতে হয়। মিথ্যা মামলা মাথায় নিয়ে কেউ কেউ এক কাপড়ে যাযাবর জীবন নিয়ে বেঁচে আছে। নিজ এলাকা ছেড়ে কেউ কেউ গিয়ে পালিয়ে থাকে টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন জায়গায়। '৮৪ সালে জোতদারদের ১৮টি ভুয়া দলিলের ৬৫ বিঘা জমি খাস খতিয়ানে চলে এলে তারা ভূমিহীন এবং উন্নয়ন সংগঠন সমতার কর্মকর্তাদের শায়েস্তা করতে বেছে নেয় থানা পুলিশ আর মামলা। স্থানীয় থানাকে হাতে রেখে জোতদাররা '৮৪ সালের ডিসেম্বরে সমতার কয়েকজন কর্মকর্তা এবং কয়েকশ' ভূমিহীনের নামে একযোগে এক ডজন মামলা দায়ের করে। বাস লুট, বাড়িঘর লুট, ধান লুট, জমি দখল, ধর্ষণ, সন্ত্রাস ইত্যাদি বহুবিধ নামে তারা মিথ্যা মামলা সাজায়। এই মিথ্যা মামলাগুলো হওয়ার পর ভূমিহীনদের উপল খাঁ (মৃত), বিষু মোল্লা, আবুল হাবিবুল্লাহ বাহার, নাজমুল হোসেন মজনু, সারোয়ার আলমসহ আরো অসংখ্য জন। ভূমিহীনদের অগ্রবর্তী দলনেতা হোসেন আলীর (৭০) বিরুদ্ধে ৫৬টি মামলা দায়ের করেছে জোতদাররা। মামলার জন্য পাবনা কোর্টে হাজিরা দিতে দিতে সে এখন ক্লান্ত। বৃদ্ধ বয়সে একটি ছোট দোকান নিয়ে বসেছেন সেটিও চালাতে পারছে না ঠিক মতো। আত্রাইসুকা গ্রামের দুলাল খাঁ এখনও পুলিশি নির্যাতনের নির্মম চিহ্ন নিয়ে জীবনযাপন করছেন। '৮৯ সালে একটি মিথ্যা মামলায় পড়ে পুলিশের হাতে আটক হন দুলাল খান। আটক হওয়ার পর এই ভূমিহীনের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালান সাঁথিয়া থানার তৎকালীন ওসি হান্নান। ভূমিহীন দুলাল খাঁনের বাম হাতের মাঝের আঙুলটি সারা জীবনের জন বাঁকা হয়ে গেছে। ওসি হান্নান রড দিয়ে পিটিয়ে দুলার খাঁর হাতের আঙুল ভাঙাই নয়, তার শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে বেধড়ক পিটিয়েছিলো। দুলাল খাঁ জানান, আঘাতগুলো এতোটাই নির্মম ছিলো যে, এখনও রাতে তার ঠিকমতো ঘুম হয় না, হাত-পা ব্যথা করে।

আরেক ভূমিহীন বিষ্ণুপুরের কালুর ওপর পুলিশি নির্যাতন ছিলো আরো লোমহর্ষক, যা ছিলো মধ্যযুগীয় নির্যাতনেরই নামান্তর। এই ভূমিহীন বর্তমানে বেঁচে নেই। কয়েক বছর হলো মারা গেছেন। থানায় নিয়ে এই ভূমিহীনের আঙুলে সুঁচ ঢুকিয়ে দেয়া, সিগারেটের আগুনে ছ্যাঁক দেয়া, থালা গরম করে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চেপে ধরা- এভাবে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিলো কালুর ওপর।

সমতার গণসঙ্গীত শিল্পীরা জাগরণী গান গেয়ে ভূমিহীনদের উদ্দীপ্ত করে

নারীরা অংশ নিয়েছে ভূমি আন্দোলনে

ঘুঘুদহ বিলের খাস জমিতে ভূমিহীনদের যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ভূমিহীন নারীদের সাহসী ভূমিকা বাংলাদেশের খাস জমির আন্দোলনে এক মাইলফলক। খাস জমির আন্দোলনে স্থানীয় ভূমিহীন নারীদের আগাগোড়াই যেমন পূর্ণ সমর্থন ছিলো, তেমনি জোতদারদের সঙ্গে সম্মুখ লড়াইয়ে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিলো সব সময়ই। ভূমিতে অধিকারের আন্দোলন শেষ হবার পর ঘুঘুদহের নারীরা এক নুতন আন্দোলন সূচনা করেছেন। ভূমিহীন নারীরা পাড়ায় পাড়ায় গড়ে তুলেছে সমিতি এবং উইমেন অ্যাকশন কমিটি (ওয়াক)। বিলপাড়ের বিশ গ্রামের বিচার-সালিশ এরা করে। নারীদের বিরুদ্ধে কোনো নিপীড়ন-নির্যাতন প্রতিরোধে এরা ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসে। নারীদের নির্যাতনমুক্ত রাখার পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল করে তুলতেও ওয়াক কাজ করছে। ওয়াকের কার্যক্রম সুপারভিশন করছে সমতা। উইমেন অ্যাকশন কমিটির তৎপরতার কারণে এখানে বউ তালাক, নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক বহুলাংশে কমেছে।

ঘুঘুদহে ব্রিটিশ মন্ত্রী

ঘুঘুদহের খাস জমির আন্দোলন শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়াতে খাস জমি আন্দোলনের একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হয়। দেশী-বিদেশী গবেষক, রাজনীতিক ছাড়া সুশীল সমাজের মুখপাত্রদের কাছেও ঘুঘুদহ নামটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। আর এ কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যারা খাস জমি নিয়ে কাজ করছে কিংবা যারা খাস জমি উদ্ধারের লড়াইকে এগিয়ে নিতে অর্থ যোগান দিচ্ছে তাদের অনেকেরই এ পর্যন্ত পা পড়েছে ঘুঘুদহের মাটিতে। ব্রিটিশ তরুণ জো-

ডিভাইন ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন ঘুঘুদহ বিলের ওপরেই গবেষণা করে। বেশ কিছুদিন আগে সুইডিশ মন্ত্রী মি-ইনজেন এলিনভাল ঘুঘুদহ সরেজমিনে দেখে যান এবং ভূমিহীনদের সঙ্গে নানাবিধ বিষয়ে মতবিনিময় করেন। গবেষক, রাজনীতিক, উন্নয়ন কর্মী, উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিরা সবাই ঘুঘুদহে গিয়ে ভূমিহীনদের কাছ থেকে জানতে চান তাদের লড়াইয়ের কথা; নিপীড়ন, নির্যাতনের কথা, ফেরারি জীবনের গল্প। এ সবই ঘুঘুদহের ভূমিহীনদের কাছে দারুণ সুখস্মৃতি। তবে তাদের এই সুখস্মৃতিকে সম্প্রতি আরও দীর্ঘায়িত করে গেছেন ব্রিটিশ মন্ত্রী হিলারি বেন। ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক এই প্রতিমন্ত্রী গত ১৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় সফরে এসেছিলেন বাংলাদেশে। ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি এখানে থাকেন। তারপর ফিরে যান। কিন্তু তার এই চার দিনের সফর সূচিতে একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল ঐতিহাসিক ঘুঘুদহ বিল সরেজমিনে পরিদর্শন, ভূমিহীনদের কাছ থেকে তাদের লড়াই সংগ্রাম আন্দোলন সম্পর্কে জানা এবং সমতা কীভাবে ভূমিহীন নারী-পুরুষদের পরিচালনা করছে তা দেখা।

আতঙ্কের নাম মঞ্জুর কাদের

আশির দশকের শুরুতে ঘুঘুদহে ভূমিহীনরা জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুললে তৎকালীন এরশাদ সরকারে নেতা মেজর (অবঃ) মঞ্জুর কাদের এমপি জোতদারদের পক্ষ নিয়ে মিথ্যা মামলা, পুলিশ প্রশাসন দিয়ে ভূমিহীনদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। মঞ্জুর কাদেরের ছত্রছায়ায় জোতদাররা অর্ধযুগ ধরে ভূমিহীনদের ওপর যে নির্যাতন চালায় তা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, ড. আবুল বারকাত তার 'পলিটিক্যাল ইকোনমি অব খাস ল্যান্ড ইন বাংলাদেশ' নামক গবেষণা গ্রন্থে।

ঘুঘুদহের বিলে প্রায় ২০ জন জোতদার খাস জমি এতকাল ভাগ বাটোয়ারা করে খেয়েছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জোতদার ছিলেন গৌরি গ্রাম ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আ. সাত্তার। ঘুঘুদহে তার দখলে জমি ছিল প্রায় ৩৫০ বিঘা। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'আমি এখন বুঝতে পেরেছি আমি এতকাল অন্যায় করেছি, তাই এই ভূমি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছি। এখন আমি চাই দেশের সব খাস জমিতে ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হোক।

যেভাবে গড়ে ওঠে ভূমিহীনদের সংগঠন

মোঃ আব্দুল কাদের সাঁথিয়ার প্রত্যন্ত গ্রাম বিষ্ণুপুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক কফিল উদ্দিন প্রামাণিকের দ্বিতীয় পুত্র। ১৯৭৪ সালে ডিগ্রি পাস করার আগের বছর থেকেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। বরাবর সংস্কৃতি অনুরাগী এই যুবক ১৯৭৬ সালে তার কয়েক বন্ধুকে নিয়ে বিলপাড়ে বিষ্ণুপুর সমিতি গড়ে তোলেন। এ সমিতি প্রথম পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং একই সঙ্গে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ছোটখাটো জনকল্যাণমূলক কাজ করতে থাকে। এভাবে কাজ করতে করতে সমিতির সদস্যরা নিজেদের গ্রামকে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। সে লক্ষ্যেই ১৯৭২ সালে বিষ্ণুপুর যুবক সমিতির নাম পরিবর্তন করে 'নবজাগরণী সংঘ' করা হয়।

ভূমিহীনদের একটি গণজমায়েত

নবজাগরণী সংঘের মূল লক্ষ্য নির্ধারিত হয় বিষ্ণুপুরকে স্বনির্ভর ও আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলা। একই বছর নবজাগরণী সংঘের নেতৃত্বে বিষ্ণপুর কৃষক সমবায় সমিতি সংগঠিত হয়। এ পর্যায়ে আব্দুল কাদের স্থানীয় ভূমিহীনদের সংগঠিত করে কিছু একটা করার জন্য সমতা সমাজকল্যাণ সমিতি নামে নতুন সংগঠন তৈরি করেন। এক পর্যায়ে সমতা সমাজকল্যাণ সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় ঘুঘুদহ বিলের খাস জমিতে ভূমিহীনদের দখলে নেয়ার জন্য তারা আইনি লড়াই শুরু করবে। যেমন সিদ্ধান্ত তেমন কাজও শুরু হয়ে যায়। ১৯৮৩ সালে স্কুল মাস্টার আব্দুল কাদেরের নেতৃত্বে সমতা ভূমিহীনদের বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন সূচনা করে। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে ওঠে ভূমিহীনদের সমিতি। হাজার হাজার ভূমিহীন সমবেত হতে থাকে সমতার আশ্রয়ে। প্রথমে আইনি লড়াই করে জমিতে ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, তারপর সবাই মিলে জমির দখল গ্রহণ- এভাবেই আগাতে থাকে সমতার ভূমিহীন আন্দোলন। আব্দুল কাদের এবং তার সহযোদ্ধা ভূমিহীনদের ওপর নেমে আসে জোতদার এবং প্রশাসনের নানারকম নির্যাতন। সর্বহারা ধুয়া তুলে নির্যাতন চলে ভূমিহীনদের ওপর। জেল-জুলুম-মামলা এবং হামলা দিয়ে অতিষ্ঠ করে তোলে সমতার কর্মকর্তা এবং ভূমিহীনদের। আব্দুল কাদের মিথ্যা মামলায় ২ দফায় ৩ বছর জেল খেটেছেন। তার বিশ্বস্ত সহযোগী সরোয়ার আলম ৩ দফায় সাড়ে চার বছর জেলে থেকেছেন। ৩০৬ জন ভূমিহীন জেল খেটেছে বিনা অপরাধে।

এত অত্যাচার নির্যাতন এবং জীবনের ঝুঁকি সত্ত্বেও আব্দুল কাদের সরে যাননি ভূমিহীনদের পাশ থেকে। ভূমিহীনরা জীবন বাজি রেখে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

ঘুঘুদহের পাড়ের এক হাজার পরিবারের দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। তারা এখন খন্ড খন্ড জমির মালিক। বছর শেষে ধান ওঠে ঘরে, অন্যান্য মৌসুমী ফসলও পাওয়া যায়। তাতে তাদের ৮/১০ মাসের খোরাক হয়ে যায়। অন্যদিকে আব্দুল কাদের সরকারি অর্থ ঋণ নিয়ে ৬০০টি পরিবারকে ছোট ছোট টিনের ঘর করে দিয়েছে। ঘুঘুদহ পাড়ের মানুষের কাছে আব্দুল কাদের এখন পরম আস্থা এবং নির্ভরতার প্রতীক। আব্দুল কাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি কিভাবে সংগঠিত করে ধরে রাখলেন বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে?

তিনি ২০০০কে বলেন, 'আমি তাদের ন্যায্য অধিকারের কথা বুঝিয়েছি। তারা আমার কথা বুঝতে পেরেছে। যাদের জন্য আন্দোলন তাদের সংগঠিত ও সচেতন করতে পারলে যে কোনো আন্দোলন সফল হতে পারে। তারপর আমার ওপর তাদের আস্থা ছিল। তারা যখন দেখেছে শতরকম নির্যাতন সত্ত্বেও আমি তাদের ছেড়ে যাচ্ছি না তখন তারাই আমার রক্ষাকবচ হয়ে ওঠে।'

এক সমীক্ষায় দেখা যায়, দেশের ৫৭.৫ ভাগ মানুষ ভূমিহীন। ঘুঘুদহের নিরক্ষর ভূমিহীনদের এই সফল সংগ্রাম দেশের ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ছবি : **এন্ড্রু বিরাজ**